।। তালের উৎপত্তি।।

পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরা রাক্ষসকে বধ করার পর শিব আনন্দের আতিশয্যে সম্পূর্ণ বেতালা নৃত্য আরম্ভ করেন। তখন পৃথিবীর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে, পৃথিবী তখন দুলতে থাকে এবং প্রলয় কালের অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন ব্রহ্মা এই পরিস্থিতি দেখে একটি বাদ্যযন্ত্র তৈরী করে গণেশকে বাজাতে বলেন। গণেশের পটু হাতে ঐ বাদ্যযন্ত্র বাজবার ফলে শিবের নৃত্যে ছন্দ এসে যায়—পৃথিবী রক্ষা পায়। ব্রহ্মা নির্মিত সেই বাদ্যযন্ত্রের নামই নাকি পরে হয় 'মৃদঙ্গ' এবং মৃদঙ্গের সার্থক বাদক রূপে গণেশ আজো বাদ্য শিল্পীদের কাছে পূজিত হ'ন।

শৈবমতে ত্রিপুরাসুর বধের পর হরগৌরী যে বিজয়োল্লাসে নৃত্য করেছিলেন, সেই নৃত্য থেকেই নাকি প্রথম তালের উৎপত্তি হয়েছিল। 'হরনৃত্যস্য তাণ্ডবং গৌর্য্যানৃত্যস্য লাস্যম্"। শিবের তাণ্ডবনৃত্যের 'তা' এবং গৌরীর লাস্য নৃত্যের 'ল' এই দু'য়ের মিলনেই তালের উৎপত্তি। কোহলের "তাললক্ষণ" গ্রন্থে আছে—

"তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকার শক্তিরূচ্যতে।
শিবশক্তি সমাযোগাত্তালা নামাভিধীয়তে।।"

বিশ্বজোড়া প্রচলিত ছন্দলীলার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের একটা রূপ আমাদের চোখে ভেসে ওঠে "রুদ্রডমরুসূত্রবিবরণম্" থেকে—

"তালাত্মকং জগৎ সর্বং তালস্তু ব্যাপকঃ স্মৃতঃ।
সূত্রে সূত্রে স তালঃ স্যাৎ স তালঃ কালসম্ভবঃ।।"

প্রাচীন নাট্যকারদের লেখায় দেখা যায়, নটরাজ শিব থেকে 'নাদ'-এর জন্ম, 'নাদ' থেকে 'মন' এবং 'মন' থেকে 'কাল' অর্থাৎ তালের সৃষ্টি—

"শম্ভোঃ সংপদ্যতে নাদো নাদাদ্যুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসো জায়তে কালঃ স কালস্তাল সংজ্ঞিত।।"

(—'ভরতমঞ্জরী')

আবার তালের উৎপত্তি সম্পর্কে 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানেও দেখা যায় সেই প্রাচীন শৈব মতবাদেরই প্রতিফলন, অর্থাৎ পুরুষের তাণ্ডব নৃত্যের 'তা' নারীর লাস্য নৃত্যের 'ল' এই দু'য়ে মিলেই তালের উৎপত্তি।

"পুরুষ নৃত্যস্য তাণ্ডবং নার্য্যানৃত্যস্য লাস্যমিতি নাম,
তাণ্ডবস্যাদ্যাক্ষরেণ লাস্যস্যাদ্যাক্ষরেণ চ মিলিত্বা তাল।"

একদা খ্যাত রাধামোহন সেন লিখিত 'সঙ্গীত তরঙ্গ' গ্রন্থে তালের উৎপত্তি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"হরগৌরী নৃত্য হইতে সৃষ্টি হইল তাল।
তালের কারণ দুই—ক্রিয়া আর কাল।।

হরের নৃত্যের নাম তাণ্ডব প্রকাশ।
পার্ব্বতীর যেই নৃত্য, তার নাম লাস।।
অর্থাৎ তাণ্ডব নাম নরের নটনে।
লাস নাম নিরূপণ নারীর নর্ত্তনে।।
অতএব শিবশক্তি নৃত্য অভিরাম।
আদ্য আদ্য বর্ণযোগে হৈল তালা নাম।।"

(—ইন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)

'তাল' আসলে প্রকৃতিরই সৃষ্টি—প্রাণীর হৃদস্পন্দন, সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবিরাম ঘোরা-এ সবই একটা ছন্দে বা তালেই হয়ে যাচ্ছে, যদি হঠাৎ ছন্দপতন বা বেতালা হয়, তাহলে প্রাণীর মৃত্যু বা ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। মানুষের কথা বলা, খাওয়া, হাঁটা চলা সবই একটা ছন্দের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ সবই একটা নির্দিষ্ট তালে বা ছন্দে চলে আসছে।

"উৎপত্যাদি ত্রয়ংলোকে যতস্তালেন জায়তে।
কীটকাদি পশুনাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ।।
যানি কানি চ কর্ম্মানিলোকে তালাশ্রিতানি চ।
আদিত্যাদি গ্রহনাঞ্চ তালেনৈব গতির্ভবেৎ।।"

(—রাগকল্পদ্রুম)

ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি এবং ছন্দের কারণেই তালের সৃষ্টি। তাল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—"কাব্যে ছন্দের যে কাজ গানে তালের সেই কাজ। কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেটাই লয়।"

"Rhythm may be defined in its broadest sense as a series of sound arranged in regular sequence of pitch and time. Its ultimate origin is no doubt physiological - perhaps connected with the heart beat."

(–George Tomson)

"প্রাণীজগতে ছন্দের একটা জৈবিক প্রয়োজনীয়তা আছে; মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে সে এই ছন্দের লীলা অনুভব করে। ছন্দের আকর্ষণ মানুষকে ক্রমশ একটা বিশেষ আনন্দ আস্বাদনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সুর সৃষ্টির মধ্যে, এমন কি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে, অনিবদ্ধস্বরূপে একটি সহজ ছন্দবোধ তাকে পরিবেষ্টন করে থাকে।"

(—ডঃ অরুণ ভট্টাচার্য, 'নন্দন তত্ত্বের সূত্র')

তালের উৎপত্তি ও বিকাশ

আদিমানবের গভীরতম অন্তরের প্রগাঢ় অনুভূতি তথা সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে সংগীত তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্য যে একান্তভাবে সম্পৃক্ত ছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় এবং তাল ছিল এই সংগীতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'রাগ কল্পদ্রুম'-কারও বলেছেন 'উৎপত্তাদি এবং লোকে যত্রতালেন জায়তে'।

তালহীন নৃত্য, গীত বা বাদ্য অকল্পনীয়। কারণ সংগীতের শৃঙ্খলা, সংযম, মাধুর্য ইত্যাদি সবকিছুই তালের উপর নির্ভরশীল। 'ভক্তি রত্নাকর'—কার নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন :

"গীতে তালযুক্ত তালবিনা শুধি নয়।
যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয়।।"

দামোদর মিশ্র তাঁর "সংগীত দর্পণ" গ্রন্থে গীত বাদ্যকে মত্ত গজের সঙ্গে এবং তালকে অঙ্কুশের সঙ্গে তুলনা করেছেন :

তৌর্যত্রিক চ মত্তে ভত্তা লেভস্যাঙ্কুশং বিদুঃ।

'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থকার তালের প্রাধান্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

"মুখ প্রধান দেহস্য নাসিকা মুখমধ্যকে।
তালহীনং তথা গীতং নাসাহীনং মুখং যথা।।"

অর্থাৎ দেহের মধ্যে মুখমণ্ডল এবং মুখমণ্ডলে নাসিকা প্রধান। তালহীন গীত নাসাহীন মুখমণ্ডলেরই মতো।

একথা বলা যায় যে গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তালেরও উৎপত্তি হয়েছিল এবং যুগের প্রয়োজনানুসারে বিকশিত হয়েছে। এর ফলে আমরা দেখি যে ভারতীয় সংগীতে প্রাচীন কাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত তালের এবং তাল-বাদ্যাদিরও একটি ক্রমবিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রকাররা তালের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন, যেমন— অভিনব 'তাল-মঞ্জরী'-কার এর মতে :

তকারঃ শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারঃ পার্বতীস্মৃতা।
শিবশক্তিসমাযোগাৎ তাল ইত্যভিধীয়তে।।

অর্থাৎ ত-কারে শঙ্কর এবং ল-কারে পার্বতীকে বোঝায়। এই দুইয়ের সংযোগে 'তাল' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।

এই একই কথা 'ভারত কোষ' গ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে ; অর্থাৎ হর-গৌরীর তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের আদ্যক্ষরদ্বয় নিয়ে 'তাল' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। 'সংগী তরঙ্গ' গ্রন্থে বলা হয়েছে : "হরগৌরী নৃত্য হইতে সৃষ্টি হইল তাল।"

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় সংগীত ক্রমবিকশিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে। তবে প্রাগ্বৈদিক যুগেও মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে সেই সময়কার সংগীতচর্চার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন, "...মৃৎপাণি চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, খঞ্জনী বা করতাল, একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা ও একটি মৃন্ময় নর্তকের ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে।" তবে তারও পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে প্রকৃত উন্নত মানের ছিল তা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। তাই অনুমান করা যায় যে সেই উন্নত সভ্যতায় সংগীতও বিকশিত হয়েছিল।

অনেকের মতে মহেন্‌জোদড়োর সভ্যতা ও সংস্কৃতি বৈদিক সভ্যতার মধ্যেই পড়ে। তবে এ বিষয়টি এখনও বিতর্কিত। যাই হোক বৈদিক যুগ হতেই আমরা দেখি যে সংগীতের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সঙ্গে তালেরও বিকাশ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ ডি এন আপ্টে বলেছেন :

"Among the musical instruments known are the aghati (Cymbol) to accompany dancing (RV and AV), drums, flutes and beetes of various types, and the harp or lyre with a hundred strings (vana). Many other instruments, of which we cannot form and exact idea, are also nawed" (The History and culture of the Indian people : The Vedic Age, Vol-I, p-456)।

সংগীতের ক্রমবিকাশে বৈদিক যুগের পরই এল গান্ধর্ব গীতিধারা। এর সময়কাল হল খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ শতাব্দী। সদাশিবভরত, ব্রহ্মভরত সহ একাধিক গুণী গান্ধর্ব সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্বাব্দের রামায়ণ, মহাভারত, খিল হরিবংশ ইত্যাদিতেও সংগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ মৃদঙ্গের শব্দকে মেঘগর্জনের তুল্য বলা হয়েছে। "আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনা দৈর্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্" (৩৬)। মহাভারতেও গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ যুগেও চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রাদি প্রচলিত ছিল। এরপর নাট্যশাস্ত্রের যুগে সংগীতের অন্যান্য শাখার সঙ্গে তালও সুনিয়ন্ত্রিত হল। তৎকালীন মার্গতালগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল পঞ্চপাণি, চঞ্চৎপুট, চাচপুট ইত্যাদি এবং এই তালগুলির উপর ভিত্তি করে আরও কিছু নতুন তালের উদ্ভব হয়েছিল।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পর নারদ, শাঙ্গদেব, কোহল মতঙ্গ, নন্দিকেশ্বর, দত্তিল, শার্দুল স্বাতি, তম্বুরা, যষ্টিক, শাণ্ডিল্য, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি একাধিক সংগীতগুণিদের গ্রন্থে আমরা তালের ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক চিত্র পাই।

যুগপ্রবাহে নৃত্য ও গীতের সঙ্গে চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রাদিরও নানা বিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক কালে বাদ্যযন্ত্রাদিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে : তত, সুষির, অবনদ্ধ ও ঘন। চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যগুলিকে বলা হয়েছে অবনদ্ধ বাদ্য। বর্তমানে গীতে তালবাদ্যের মধ্যে তবলাই সর্বাধিক প্রচলিত এবং বলা বাহুল্য যে তবলা সহ সকল তালবাদ্যের বাদন পদ্ধতি আজ যথেষ্ট উন্নত তথা বিজ্ঞানসম্মত।